জ্ঞানের পথে যাওয়াই সমস্যা

আবীর হাসান

ঘটনার সমারোহ বাংলাদেশে অতিমাত্রিক, তবে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে আরো অনেক ঘটনাই থেকে যায় নিভৃতে। উন্নয়নের গতিধারার সংবাদকে অনেক সময় আমরা বিশ্বাসও করতে চাই না। বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয়, তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটা অনেকটাই যেনো অন্তরালবর্তী। একথা ঠিক, এ ধরনের কর্মকাণ্ড সৌধ বা সেতু নির্মাণের মতো নয় যে, চর্মচক্ষে দেখে বাহবা দেয়া যাবে। তবে স্বীকার করতেই হবে (বাহবা দেন বা না দেন), আমাদের প্রতিদিনের কাজের মধ্যে ডিজিটাল বিষয় ঢুকে তো গেছেই, আমাদের অজ্যাসেরও অন্তর্গত হয়ে গেছে। প্রতিদিনের যোগাযোগের কথাই ধরুন– শহরাঞ্চল শুধু নয়, গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষও এখন ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় আছেন। ব্যবহার করছেন অত্যাধুনিক সেবা। যোগাযোগের দ্রুততা কিছু স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে, গতি এনেছে অনেক অর্থনৈতিক কার্মকাণ্ডে। দেখতে দেখতে মোবাইল ব্যাংকিং আর মানি ট্রান্সফার চালু হয়ে গেছে। আরও অনেক কিছুই হচ্ছে, তবে ঝোঁকটা অবশ্যই প্রথাগত ইন্টারনেটের চেয়ে মোবাইলের দিকেই বেশি।

'ইন্টারনেটের উপযোগিতা নেই'– এ কথা আইসিটিসংশ্লিষ্ট কেউ স্বীকার করবেন না, তবে এদেশে যে ইন্টারনেটের অব্যবহার বেশি হচ্ছে সেটাও বাস্তবতা। বহুদিন আগে থেকেই এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হলেও সমস্যাটা আগের পর্যায়েই রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সচ্ছল মানুষ ইন্টারনেটকে বিনোদন বা সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছেন। আবার যারা জ্ঞানার্জন বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে চান, তারা ব্যয়বাহুল্যের কারণে তা করতে পারছেন না। মূল বিষয় হচ্ছে, দেশে অভ্যন্তরীণভাবে ইন্টারনেটের উপযোগিতা তৈরি হয়নি। পোশাক শিল্প, আমদানিকারক এবং মিডিয়া ছাড়া ইন্টারনেটের যথাযথ ব্যবহার অন্যত্র হচ্ছে কি না সন্দেহ আছে।

মে মাসের দুটো ঘটনার কেন্দ্রে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথম ঘটনাটি শিক্ষা সম্পর্কিত। শিক্ষকদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেছেন, শিক্ষকদের আইসিটি ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। ডিজিটাল ক্লাস প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে কমপিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রসঙ্গ যখনই ওঠে তখনই স্বাভাবিকভাবে চলে আসে শিক্ষকদের অভ্যস্ত করে তোলা এবং প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো। কনটেন্ট নিয়ে আলোচনাও হয় কমবেশি। কিন্তু গত বিশ বছরে অবস্থার পরিবর্তন খুব একটা হয়েছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষাদানে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি শিক্ষকেরা। বিষয়টিকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় খুব সহজেই। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষকেরা এখন প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠদান করছেন তারাও এদেশেরই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষালাভ করেছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকতা করার জন্যও প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। কিন্তু একথা এখন বলতেই হচ্ছে যে শিক্ষা ব্যবস্থাটিই রয়ে গেছে পুরনো ধাচের বা প্রথাগত। প্রশ্ন এবং উত্তরের নির্ধারিত সেটের বাইরে যে বেরুনো যাচ্ছে না– এটা একটা মারাত্মক সমস্যা। শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের সাগরে ছেড়ে দেয়ার প্রত্যয়টা প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না কোনোক্রমেই যতই প্রযুক্তি সুবিধাজনক হয়ে উঠুক না কেন। গত ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষকেরা গাইড-নোট-সাজেশন বিক্রি করে পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে জ্ঞানী শিক্ষক আর মহৎ শিক্ষাদানবিষয়ক ধারণাটাই উঠে গেছে। শিক্ষার্থীকে যখন নোট-গাইড-সাজেশনের বোঝা দিয়ে চাপা দেয়ার কাজটা শিক্ষকেরা করেন তখন শিক্ষার্থী নৈতিকভাবেই রুষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষকও বেছে বের করতে পারেন না সত্যিকার মেধাবী শিক্ষার্থীদের।

প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী ভালো ফল করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন, কেউ কেউ শিক্ষকও হচ্ছেন, কিন্তু তাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু সে প্রশ্ন থেকেই যায়। এদেরকে নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয় না, দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভিত্তিমূলক জ্ঞানও দেয়া হয় না; ফলে জ্ঞানচর্চার বা নতুন কিছু শেখার এবং শেখানোর কোনো তাগিদ শিক্ষকরা অনুভব করেন না। সাম্প্রতিককালে কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু তা করতে গিয়ে শিক্ষক পেতে যেমন সমস্যা দেখা দিয়েছে তেমনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিতেও বেগ পেতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ইংরেজি বোঝা এবং কমপিউটার-ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বেরুনো তরুণ শিক্ষকদের আইসিটিবিষয়ক ধারণা অদ্ভুত ধরনের নিম্নমাত্রার। আর এর কারণ একটাই– ইংরেজি ভীতি-জ্ঞান ভীতি।

অনেক কিছুর সরলীকরণ করতে গিয়ে আমরা ইংরেজি ভাষা শিক্ষকে এমন একটা ত্রাতা অবস্থায় নিয়ে গেছি যে, শিক্ষিত করেও নতুন প্রজন্মকে বহুমাত্রিক করে তোলা যাচ্ছে না। আর সে কারণেই আইসিটির ভেতরে থাকা বিশাল জ্ঞানের রাজ্যেও তারা প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আর একটা ধারণাও দেয়, বিশেষায়িত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞান অপ্রয়োজনীয়।

ডিজিটাল ক্লাস বা আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রচলন করতে গেলে ইংরেজি বুঝতে পারা এবং ইন্টারনেটে জ্ঞানের ভাণ্ডারের সন্ধান জানা শিক্ষক প্রয়োজন হবে।

এই ভবিষ্যৎবাচক 'হবে' শব্দটা লেখা হচ্ছে গত বিশবছরের বেশি সময় ধরে। কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়াস চোখে পড়েনি তেমন একটা। এখন যখন ডিজিটাল ক্লাস তথা শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির প্রয়োগ করতে চাচ্ছে সরকার তখন একটা বিশেষ উদ্যোগ নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। এজন্য শিক্ষা বোর্ডই নয়, অন্য যথাযথ একাডেমিক ফোরামকেও এ কাজে নিয়োজিত করা যায়।

অনলাইন আয়কর পরিশোধ পদ্ধতির উদ্বোধন

গত মাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী নিজে অনলাইনে অগ্রিম আয়কর দিয়ে এ পদ্ধতির উদ্বোধন করেন। এশিয়ার অনেক দেশের আগেই বাংলাদেশে এ পদ্ধতির চালু হলো। অবশ্যই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সরকারের এটি মহতী উদ্যোগ। তবে এখানেও দুটো সমস্যা। প্রথমত, আয়কর যারা দেন তাদের সচেতনতা এবং আইসিটি ব্যবহারের সহজলভ্যতা। বাংলাদেশে আয়কর দেয়ার যোগ্য অনেক লোকই আয়কর দেন না। কেউ দেন না সচেতনভাবে, কেউ দেন না ইচ্ছা করেই। অথচ সরকারের অন্যতম আয়ের উৎস তো এই আয়কর। তবে এমন আশা করা ঠিক হবে না যে অনলাইনে করদান পদ্ধতি চালু হয়েছে বলে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওই ব্যবস্থায় কর দিতে থাকবেন। পদ্ধতি চালু হয়েছে ঠিকই, তবে এখন এই প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

আইসিটি যে এখন সব কাজের মাধ্যম হয়ে উঠছে সেটা খোলাসা করে না বললেও চলে। কিন্তু আইসিটিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক দ্রুত অগ্রসরমান সমাজ গড়ে তুলতে হলে টেলিডেনসিটির মতো ইন্টারনেট ডেনসিটি বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রেও কতগুলো সমস্যা নিরসন করেই এগুতে হবে, প্রথম প্রযুক্তি ব্যবহারে যাতে বিঘ্ন না থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্ভবত মোবাইল টার্মিনালনির্ভর থ্রিজি প্রযুক্তিতে উত্তরণ জরুরি, আর সেই সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যয়বাহুল্যও কমাতে হবে। আর ইংরেজি ভীতি দূর করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগী সংস্কার এনে। জ্ঞানের পথে যেতে বারবার বাধা পাওয়া একটা সমস্যাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এ জাতির জন্য। এই সমস্যাটাও নিরসন করতে হবে একই সাথে।

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com